বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খ- ৩০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৯

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ: রস্টোর স্ড়র তত্ত্বের নিরিখে একটি পর্যালোচনা

জি এম সোহরাওয়ার্দী*

১। পটভূমি

খুব বেশি দিন হয়নি উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান ও চর্চা শুর- হয়েছে। মাত্র এক প্রজন্মকাল আগে অর্থনীতির একটি উপধারা হিসেবে তার জন্ম (সেন ১৯৯০); যদিও সপ্তদশ শতকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল। এ আলোচনা জোরালোভাবে শুর- হয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যার পরিণতিতে 'উন্নয়ন অর্থনীতি' নামে অর্থশাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র শাখা জন্ম লাভ করে। ১৬৭৬ সালে স্যার উইলিয়াম পেটি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে লিখেছিলেন (ইসলাম ২০১০)। তার ঠিক একশ বছর পর, ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রাজনৈতিক অর্থনীতির ধ্র-পদী গ্রন্থ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations যেখানে অ্যাডাম স্মিথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কসের লেখাতেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। এ সময় সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ পর্যালোচনায় মার্কস একটি মৌলিক, বৈজ্ঞানিক বিশেণ্ডষণ হাজির করেন। তার তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে বিশ শতকে কোনো কোনো তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে রস্টোর স্ড়র তত্ত্ব বিশেষভাবে উলেণ্ডখযোগ্য। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তার রচিত পুস্ড়ক The Stages of Economic Growth: a Non Communist Manifesto-তে মার্কিন অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ওয়াল্ট হুইটম্যান রস্টো (১৯১৬-২০০৩) তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক স্ড়র তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

রস্টো তার স্ড়র তত্ত্বের মাধ্যমে ইংল্যান্ডসহ সমসাময়িক কতিপয় পুঁজিবাদী দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা বিশেণ্ডষণ করেন। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ড যদি শিল্প পুঁজিবাদের ধ্র-পদি দৃষ্টান্ড় হয়ে থাকে, তবে ভারতবর্ষের অধীন বাংলাকে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের ধ্র-পদি দৃষ্টান্ড় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় (ইসলাম ২০১২)। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর বাংলায় ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের রূপান্ড়র প্রক্রিয়া পাকিস্ড়ান রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে বাধাগ্রস্ড় হয়, দেশটির উপর আবারও ঔপনিবেশিক ধরনের জাতিগত শোষণ চেপে বসে। কেবল ১৯৭১ সালে চূড়ান্ড় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরই বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের স্বাধীনতা উত্তর রূপান্ড়র প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে পারে। তবে স্বাধীন রাষ্ট্রের সেই জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ অর্থনীতিবিদদের হতাশাব্যঞ্জক ঠিকুজির পালণ্ডায় পড়েছে (খান ২০১১)। সত্তরের দশকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেন নরওয়ের অর্থনীতিবিদ ফাল্যান্ড ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ পারকিন্সন। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত বই Bangladesh: Test Case for Development-এ তারা লিখলেন, 'যদি বাংলাদেশে উন্নয়নের উদ্যোগ সফল করা যায় তবে এ ধরনের উদ্যোগ যে কোনো দেশেই সফল করা যাবে- এ অনুমানের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের খুবই কম অবকাশ থাকবে। এই অর্থেই বাংলাদেশ হবে উন্নয়ন অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য নজির'। যদিও নৈরাশ্যবাদী এই অর্থনীতিবিদদ্বয় ২০০৭ সালে এসে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন, 'এই মুহূর্তে তিন দশক এবং তার বেশি সময়ের সীমিত ও বর্ণাঢ্য অগ্রগতির ভিত্তিতে মনে হয় বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব, তবু এ সম্ভাবনা

* গবেষণা পরিচালক, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মোটেও নিশ্চিত নয়'। বাস্ড়বে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত চার দশকে অনেক সাফল্য যেমন অর্জন করেছে, তেমনি এর বেশ কিছু ব্যর্থতাও আছে। সাদা চোখে দেখে মনে হয়, এই দেশের একটি অংশ (আকারে ছোট হলেও) যেন উন্নত বিশ্বে পৌঁছে গেছে, আর অন্য অংশটি (আকারে যেটি বেশ বড়) আগে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে রস্টোর স্ড়র তত্ত্বের নিরিখে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

২। প্রবন্ধের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও বিশেণ্ডষণ কাঠামো

উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে সন্দেহ প্রকাশ করে মন্ড়ব্য করেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশ রস্টোর বর্ণিত স্ড়রগুলোর কোনো একটির সাথে আদৌ চিহ্নিত করা যায় না। যেসব দেশ উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে তাদের বেলায় এ মন্ড়ব্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ কোনো কোনো বিষয়ে একটি দেশ উড্ডয়নের পূর্বাবস্থায় থাকলেও উড্ডয়ন স্ড়রের দু একটি শর্ত পূরণ করতে পারে। অর্থাৎ রস্টোর বর্ণনাতে এই দুই স্ড়রের মধ্যকার সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয় (ইসলাম ২০১০)। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতার কথাই ধরা যাক। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতি রস্টো বর্ণিত আদিম সমাজে যেমন বিদ্যমান নেই, ঠিক তেমনি রস্টোর নির্দেশিত চূড়ান্ড় উন্নয়ন স্ড়র তথা উচ্চ গণভোগের কালেও এখনো পৌঁছায়নি। কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে এই দুই স্ড়রের বৈশিষ্ট্যসমূহেরই 'অবশেষ' (সনাতন সমাজের) বা 'প্রারম্ভ' (উচ্চ গণভোগের কালের) বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সীমিত আকারে হলেও বিদ্যমান। অপরদিকে মাঝের তিনটি স্ড়রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক (নিকট অতীত ও বর্তমান) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে নানা মাত্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। এক্ষেত্রে রক্ষণশীল অর্থনৈতিক বিশেণ্ডষকরা হয়তো মন্ড়ব্য করবেন বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো উড্ডয়নের পূর্বাবস্থায় রয়ে গেছে, অন্যদিকে অতি উৎসাহী অর্থনৈতিক বিশেণ্ডষকরা হয়তো দাবি করে বসবেন এদেশের অর্থনীতি ইতিমধ্যেই পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা শুর" করেছে। অন্যদিকে রস্টো স্বয়ং তার তত্ত্বের মাধ্যমে কেবল পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোরই নয় বরং ল্যাটিন আমেরিকা (যেমন-আর্জেন্টিনা) এবং এশিয়ারও কতিপয় উন্নয়নশীল দেশের (যেমন-ভারত ও চীন) অর্থনৈতিক গতিপথ বা কালপর্ব চিহ্নিত করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে রস্টোর তত্ত্বে উলেণ্ডখিত কোনো স্ড়র দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো কালপর্বকে চিহ্নিত করা যায় কিনা সেটি পরীক্ষা করা। প্রবন্ধটির সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে রস্টোর স্ড়র তত্ত্বের নিরিখে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিক্রমায় রস্টো নির্দেশিত সনাতন সমাজের শর্তসমূহ পরীক্ষা করার জন্য আর্যপূর্ব বাংলার অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশ থেকে প্রাক-ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ড় সময়ের সংশিণ্ডষ্ট তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে। এ সময়কালকে সরলভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অমুসলিম শাসনামল (আর্যপূর্ব সময়কাল, আর্যপরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্রাট এবং রাজাদের শাসনকাল- দ্বাদশ শতক পর্যন্ড়) ও মুসলিম শাসনামল। আবার মুসলিম শাসনামলকে (ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ড়) দুই ভাগে ভাগ করা যায়: প্রাক-নবাবি আমল ও নবাবি আমল। উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী পরীক্ষা করার জন্য নজর দেওয়া হয়েছে ঔপনিবেশিক (ব্রিটিশ) ও আধা-ঔপনিবেশিক (পাকিস্ড়ানি) শাসনামলের দিকে। এখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালও আবার দ্বি-বিভাজিত: কোম্পানির শাসনামল (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে ১৮৫৮ সালের সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ড়) ও ব্রিটেনের রাণীর সরাসরি শাসন পর্ব (১৮৫৮-১৯৪৭)। উড্ডয়নকালের শর্তসমূহ পরীক্ষা করার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই দশক এবং পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা- এ স্ড়রের বৈশিষ্ট্যাবলী

পরীক্ষা করার জন্য বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ড় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথ পর্যালোচনা করা হয়েছে। রস্টোর উন্নয়ন স্ড়রের চূড়ান্ড় পর্ব তথা উচ্চ গণভোগের কালে বাংলাদেশের পৌঁছুতে, রস্টোর বিবেচনা অনুযায়ীই, অন্ড়ত অর্ধ শতাব্দী লাগবে। তাই এই স্ড়রটিকে বিশেণ্ডষণের বাইরে রাখা হয়েছে।

প্রতিটি স্ড়রের আলোচনায় প্রথমেই ঐ স্ড়রের আওতাধীন সময়কালের যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ কেন নির্দিষ্ট ঐ সময়কালকেই ঐ স্ড়রের জন্য নির্ধারণ করা হলো তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপর মূল বিশেণ্ডষণ পর্বে সেই নির্দিষ্ট স্ড়রের (রস্টো নির্দেশিত) বিভিন্ন নির্দেশকের দ্বারা সমসাময়িক বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি বিশেণ্ডষণ করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে নির্দেশকগুলো কতখানি প্রাসঙ্গিক। প্রতিটি স্ড়রের আলোচনা শেষ হয়েছে সেই নির্দিষ্ট স্ড়রটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐ নির্দিষ্ট কালপর্বকে কি মাত্রায় চিহ্নিত করতে পারে সেই উপসংহার টেনে।

৩। রস্টোর স্ড়র তত্ত্ব

মার্কসের মতো রস্টোও তার বিশেণ্ডষণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি স্ড়রের কথা উলেণ্ডখ করেছেন এবং তার পুস্ড়কের শিরোনাম দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি (রস্টো) মার্কসের তত্ত্বের (যেটিও একটি স্ড়র তত্ত্ব) একটি বিকল্প প্রদান করতে চেয়েছিলেন; যদিও তিনি মার্কসের স্ড়রসমূহের যৌক্তিকতা, অনিবার্যতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিজের তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সংস্কার প্রয়াসী হননি। রস্টোর বিশেণ্ডষণে একটি অর্থনীতি যে সকল স্ড়রের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে সেগুলো হলো: (১) সনাতন সমাজ বা Traditional society, (২) উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা বা Preconditions for take off, (৩) উড্ডয়নকাল বা Take off, (৪) পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা বা Drive to maturity এবং (৫) উচ্চ গণভোগের কাল বা Age of high mass consumption (Rostow 1960)। স্ড়রগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো:

৩.১। সনাতন সমাজ

রস্টো Traditional Society-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'As one whose structure is developed within limited production functions based on pre-Newtonian science and technology and as pre-Newtonian attitude towards the physical world' (আলম ২০০০)। এক্ষেত্রে রস্টো সনাতন সমাজের নিম্নলিখিত ৬টি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উলেণ্ডখ করেছেন:

(১) অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক; (২) প্রাচীন এবং অনুন্নত প্রযুক্তি; (৩) সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনশীলতা কম; (৪)কিছু শিল্প স্থাপিত হলেও অনুন্নত প্রযুক্তির দর"ন সীমাবদ্ধ উৎপাদিকা; (৫) শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা; এবং (৬) ক্ষমতায় জমির মালিকদের প্রভাব।

৩.২। উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা

রস্টোর মতে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষের দিকে এবং আধুনিক যুগের শুর"র দিকে ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে এ স্ড়র প্রথম পরিলক্ষিত হয়। দেশগুলোর এ স্ড়রের যাত্রা শুর" হয় ৪টি অবস্থার সাথে সাথে। সেগুলো হলো: (১) The new learning or Renaissance, (২) The new monarchy, (৩) The new world এবং (৪) The new religion বা The reformation. এই স্ড়র আসলে একটি ক্রান্ড়িকাল, যখন একটি অর্থনীতি স্বয়ংচালিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করে। এই শক্তি অর্জনের পেছনে নিম্নের বিষয়গুলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে-

(ক) আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকা"ের উপযোগী শিক্ষা

(খ) ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার সৃষ্টি, এবং তার ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুবিধা

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার

(ঘ) আধুনিক শিল্পের বিকাশ

৩.৩। উড্ডয়নকাল

রস্টো অর্থনীতির টেক-অফ বা উড্ডয়নকালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'As an industrial revolution, tied directly to radical changes in the methods of production, having their decisive consequences over a relatively short period of time' কোনো একটি দেশের অর্থনীতি নিম্নের শর্তসমূহ প্রতিপালন করলে, রস্টোর তত্ত্বানুযায়ী সে অর্থনীতি টেক-অফ স্ড়রে বিদ্যমান বলে ধরে নেওয়া যায়:

(ক) (ঐ অর্থনীতির) উৎপাদনশীল বিনিয়োগের হার বেড়ে মোট জাতীয় আয়ের ১০% বা তার উপরে ওঠা

(খ) অন্ড়ত একটি বা তারও বেশি সংখ্যক গুর"ত্বপূর্ণ শিল্পের বিকাশ এবং উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি

(গ) উপযুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠা, যা উন্নয়নের প্রবণতা এবং উদ্দীপনার যথাযথ ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধিকে স্বয়ংচালিত করবে

রস্টো নিম্নলিখিত সময়ে বিভিন্ন দেশের টেক-অফ হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই টেক-অফের সময়সীমা হচ্ছে ন্যূনতম দু'দশক।

সারণি ১

বিভিন্ন দেশের টেক-অফের সময়সীমা

দেশ	টেক-অফের সময়সীমা	দেশ	টেক-অফের সময়সীমা
গ্রেট ব্রিটেন	১৭৮৩-১৮০২	জাপান	১৮৭৮-১৯০০
ফ্রান্স	১৮৩০-১৮৬০	রাশিয়া	১৮৯০-১৯১৪
বেলজিয়াম	১৮৩০-১৮৬০	কানাডা	১৮৯৬-১৯১৪
যুক্তরাষ্ট্র	১৮৪৩-১৮৬০	আর্জেন্টিনা	১৯৩৫
জার্মানী	১৮৫০-১৮৭৩	তুরস্ক	১৯৩৭
সুইডেন	১৮৬৮-১৮৯০	ভারত এবং চীন	১৯৫২

উৎস: আলম (২০০০)।

৩.৪। পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা

উড্ডয়নের স্ড়র সফলভাবে অর্জন করার পর একটি অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভের (অথবা পরিপক্কতা অর্জনের) সক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে। পূর্ণ বিকাশের স্ড়রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রস্টো আধুনিক প্রযুক্তির ওপর জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'As the period when a society effectively applied the range of (then) modern technology to the bulk of resources' এটি সাধারণত চার দশক পর্যন্ড় বিস্ড়তি লাভ করে। একটি অর্থনীতির এ স্ড়রে পৌঁছার জন্য রস্টো নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রস্ড়াব করেন-

(ক) অর্থনীতিতে বিনিয়োগের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় যা জাতীয় আয়ের দশ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ শতাংশ পর্যন্ড় হয়ে যায়।

(খ) নতুন প্রযুক্তির সাথে সাথে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠতে থাকে, একটি-দুটি নেতৃস্থানীয় খাতের পরিবর্তে শিল্প বিকাশের ধারায় বৈচিত্র্য আসে।

(গ) আমদানির পরিবর্তে অনেক পণ্যই দেশে উৎপাদিত হয়, রপ্তানি খাতেও নতুন নতুন পণ্য যোগ হয়।

এই স্ড়রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যায়। এই পর্যায়ে পৌঁছাতে একটি অর্থনীতির যথেষ্ট সময় লাগে— উড্ডয়নের স্ড়র সফলভাবে অতিক্রম করার প্রায় চলিণ্ডশ বছর পর কোনো অর্থনীতি পূর্ণ বিকাশের স্ড়রে পৌঁছে। রস্টো কতিপয় অর্থনীতির টেকনিক্যাল ম্যাচুরিটির নিম্নলিখিত সময় উলেণ্ডখ করেন:

সারণি ২

বিভিন্ন দেশের টেকনিক্যাল ম্যাচুরিটির সময়সীমা

দেশ	সময়	দেশ	সময়
গ্রেট ব্রিটেন	১৮৫০	সুইডেন	১৯৩০
যুক্তরাষ্ট্র	১৯০০	জাপান	১৯৪০
জার্মানী	১৯১০	রাশিয়া	১৯৫০
ফ্রান্স	১৯১০	কানাডা	১৯৫০

উৎস: আলম (২০০০)।

৩.৫। উচ্চ গণভোগের কাল

কোনো একটি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি যখন এ স্ড়রে পৌঁছায়, রস্টোর মতে, তখন সে রাষ্ট্রটি কল্যাণ রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত হয়। সে সময় ঐ অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসমূহ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে-

(ক) দেশের জনসাধারণের আয় বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌছায় যাতে তারা তাদের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য ভোগ্য পণ্য (বিশেষত: টেকসই পণ্য) এবং সেবা খাতের জন্য যথেষ্ট খরচ করতে পারে

(খ) শ্রমশক্তির কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন আসে, যার ফলে একদিকে নগরভিত্তিক শ্রমিকের অংশ বাড়ে, অন্যদিকে দক্ষ ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল শ্রমিকের অংশও বাড়ে

(গ) আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্য অতিক্রম করে সমাজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার উপর।

একটি অর্থনীতি যখন উচ্চ গণভোগের স্ড়রে পৌঁছে তখন ঐ অর্থনীতির নেতৃস্থানীয় খাতের ভূমিকা পালন করে টেকসই ভোগ্য পণ্যের শিল্প ও সেবা। ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র এ স্ড়রে পৌঁছে ১৯২০ সালে, যুক্তরাজ্য ১৯৩০ সালে, জাপান ও জার্মানী ১৯৫০ সালে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন স্টালিনের মৃত্যুর পর এ স্ড়রে পৌঁছে বলে রস্টো সিদ্ধান্ড় দেন (আলম ২০০০)।

৪। রস্টোর স্ড়র তত্ত্বের নিরিখে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা

সনাতন সমাজ ও উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা এই দুই স্ড়রের পর্যালোচনা বর্তমান বাংলাদেশের বিশুদ্ধ ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে বিশেণ্ডষণ করা সম্ভব হয়নি। পাকিস্ড়ান পর্বের আগ পর্যন্ড় অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ড় বাংলাদেশ হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলাকেই (যার মধ্যে বর্তমান পশ্চিম বাংলাও অন্ড়র্ভুক্ত) নির্দেশ করতে হয়েছে, কারণ পৃথকভাবে বর্তমান বাংলাদেশের তথ্য উলেণ্ডখিত সময়কাল পর্যন্ড় বিরল। অবশ্য যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.১। সনাতন সমাজ

সনাতন সমাজের নির্দেশক হিসেবে রস্টো যে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন তার অর্ধেকেরও বেশি (বিশেষত অর্থনীতির কৃষিভিত্তিকতা, সীমাবদ্ধ উৎপাদনশীলতা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা) এখনো বিভিন্ন মাত্রায় বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। তাই বলে এ সিদ্ধান্ত টানা মোটেও গ্রহণযোগ্য হবে না যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো রস্টো বর্ণিত সনাতন সমাজের স্তরে রয়ে গেছে। রস্টোর তত্ত্বের দ্বিতীয় স্তর তথা উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার শর্তসমূহের দিকে খেয়াল রেখেই বাংলাদেশের অর্থনীতির সনাতন সমাজে অবস্থান প্রাক-ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহের নিরিখে তৎকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যালোচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সনাতন সমাজের এই সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশ শতকের সেরা অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনসের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও আমাদের প্রভাবিত করে। তিনি লিখেছেন, 'প্রাচীনতম সময় যখন থেকে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ধরুন, খৃস্ট জন্মের দু'হাজার বছর আগে থেকে আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোনো বড় পরিবর্তন হয়নি। উঠানামা হয়েছে নিশ্চয়ই। পেল্লগ, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধও দেখা দিয়েছে। কখনও এসেছে সোনালী বিরতি। কিন্তু প্রগতিশীল কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি' (খান ২০১০)। এ প্রেক্ষিতে রস্টো নির্দেশিত সনাতন সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশের একটি পর্যালোচনা নিচে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৪.১.১। অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলায় একটি সুসমন্বিত অর্থনীতি বিরাজমান ছিল। প্রাক-শিল্প যুগের অভিধায় এদেশের কৃষি এবং উৎপাদিত পণ্যের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। গঙ্গা এবং এর শাখা প্রশাখার পলি মাটি জমে এদেশের মাটি ছিল বেশ উর্বর। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এদেশের মাটিতে চাষাবাদ হয়ে উঠে সহজ ও লাভজনক। এ কারণে স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি (ইসলাম ২০০০)। তবে কোনো দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক কিনা তা ঐ দেশের অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখযোগ্য-

১. জিডিপিতে কৃষির অবদান অর্থাৎ ঐ অর্থনীতির বাৎসরিক মোট উৎপাদনের একটি বড় অংশ সরাসরি কৃষি থেকে আসে।
২. কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান অর্থাৎ দেশের মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ সরাসরি কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে।
৩. কৃষি বহির্ভূত অর্থনীতির কৃষি নির্ভরশীলতা অর্থাৎ অর্থনীতির অন্য দুটি প্রধান খাত তথা শিল্প খাত ও সেবা খাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল থাকে।
৪. অর্থনীতির বহি:স্থ খাত তথা রপ্তানি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়।

এর বাইরেও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির আরও বৈশিষ্ট্য ও নির্ণায়ক রয়েছে নিশ্চয়ই; তবে আলোচনার পরিসর সীমিত বিধায় এ সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকেই আমরা প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষিভিত্তিকতার একটি অতি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আবহমানকাল থেকেই কৃষিভিত্তিক। এ প্রসঙ্গে গত শতকের আশির দশকের গোড়ার দিকে প্রদত্ত ড. আবদুল্লাহ ফারুকের মন্তব্য প্রণিধাণযোগ্য: 'যে সময় বা কালই বিবেচনা করা হোক, দেখা যাইবে, উৎপাদনের দিক দিয়া বাংলাদেশ আবহমান কাল হইতেই কৃষি প্রধান, এখনো কৃষি প্রধানই রহিয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্বে যে পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন করা হইত, আজও দেশের অধিকাংশ জমিতে মোটামুটি সেই একই অবস্থা চলিতেছে' (ফারুক ১৯৮৩)। বাংলাদেশের ইতিহাসের ওপর রচিত দুই খ্রুপদী গ্রন্থ The History of Bengal (THB) এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস

উভয়ই ফার"কের বক্তব্য সমর্থন করে; যদিও সর্বপ্রথম কোন জনগোষ্ঠীর হাতে এ অঞ্চলে কৃষির সূচনা হয়েছিল সে বিষয়ে উলেণ্ঢখিত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। THB-র মতে, বাংলায় 'কৃষিভিত্তিক গ্রাম' এর পত্তন একটি আর্যপূর্ব ঘটনা, এবং অষ্ট্রিকভাষী নিষাদেরাই ছিল সেসব গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে বাঙ্গালীর ইতিহাস জানায় যে, এ অঞ্চলের অর্থনীতি ও বস্ড়ুগত জীবনের ভিত্তি যে কৃষি, তা আর্যপূর্ব কাল থেকেই প্রচলিত ছিল, এবং তা আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী ভেড্ডীয়দের দ্বারাই সূচিত হয়েছিল। এই জনগোষ্ঠীও ছিল অস্ট্রিকভাষী, যারা গ্রামভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলে। লাঙ্গলভিত্তিক কৃষি তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করত, যার ফলে তেমন খাদ্যাভাব ছিল না, এবং লোক বসতিও যথেষ্ট বিস্ড়ার লাভ করেছিল (ইসলাম ২০১১)। পর্যাপ্ত তথ্য পরিসংখ্যানের অভাবে ধারণা করে এটুকু অন্ড়ত: বলা যেতে পারে, তৎকালীন জিডিপি'র উৎপাদন ও জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান- এ দু'য়ের নিরিখে আর্যপূর্ব বাংলার অর্থনীতি নি:সন্দেহে কৃষিভিত্তিক ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে আর্যদের উপস্থিতি ও প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উচ্চ জন্মহারের জন্য এখানে চাষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে এই প্রদেশের অধিকাংশ ভালো জমিই কৃষিকাজের আওতায় চলে আসে। সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ড় এদেশে সামন্ড়তান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বহাল ছিল, যেখানে কৃষিই ছিল উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম (ফার"ক ১৯৮৩)। আর্য-পরবর্তী আমলের হিন্দু যুগের শেষ পর্যন্ড় (অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ড়) সময়ের কোনো তুলনামূলক তথ্য বা পরিসংখ্যান আমাদের হাতে না থাকলেও এ সময়কার নানা কৃষিভিত্তিক শিল্প ও রপ্তানি পণ্যের বিভিন্ন উলেণ্ঢখ থেকে এ উপসংহার টানা যেতে পারে যে, সে সময়কার বাংলার অর্থনীতির কৃষিভিত্তিকতা আমাদের নির্ধারিত প্রথম দুটি নির্দেশকের (জিডিপি ও কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান) পাশাপাশি পরবর্তী দুটি নির্ণায়কের (শিল্প ও রপ্তানি পণ্যের কৃষি নির্ভরতা) নিরিখেও প্রমাণিত হয়।

মুসলিম আমলে এ অঞ্চলে কৃষিকাজ যথেষ্ট বিস্ড়ার লাভ করেছিল এবং জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। কিন্তু বাংলার জনগোষ্ঠীর কত শতাংশ সরাসরি কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত তার কোনো ধরনের তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে দেশে উৎপন্ন চাল স্থানীয় প্রয়োজনের চেয়ে যে অনেক বেশি ছিল সেটি সুস্পষ্ট। কারণ এই সময়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে, বিশেষত সিংহল, মালদ্বীপ, দক্ষিণ ভারতে প্রচুর চাল রপ্তানি করা হতো বলে প্রমাণ আছে। কি পরিমাণ চাল সে সময় উৎপাদিত হয়েছিল তা কিছুটা পরোক্ষ পদ্ধতিতে ধারণা করা যায়। সম্রাট আকবরের সময় কৃষির উৎপাদনের অর্থাৎ ধানের ফলনের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসেবে দিতে হতো। সে সময় বাংলার (বিহার ও উড়িষ্যাসহ) বাৎসরিক খাজনা ছিল এক কোটি টাকা। সমসাময়িক গ্রাম বাংলায় ১ টাকায় ৫ মন চাল পাওয়া যেত। এ হিসাবে বিহার ও উড়িষ্যা বাদ দিয়ে বাংলাদেশেই প্রায় ৮ কোটি মন চাল উৎপন্ন হতো। পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ সালে চাল উৎপন্ন হতো প্রায় ১৮ কোটি মনের কিছু বেশি। অতএব ৫০০ বছর আগে প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার জন্য ৮ কোটি মন চাল নি:সন্দেহে বাড়তি উৎপাদন সৃষ্টি করেছিল। মরিচ, আদা, হলুদ এই প্রদেশ হতে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে, পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহে, আফ্রিকা, ম্যানিলা ও চীন দেশে রপ্তানি হতো (ফার"ক ১৯৮৩)। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার আখজাত চিনি (কৃষিভিত্তিক শিল্প) দক্ষিণ ভারতে, আরবে ও পারস্যে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হতো। আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে পাট হতে প্রস্ড়ুত কাপড় ও চটের উলেণ্ঢখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ভার্থেমা ও দুয়ার্তে বারবোসা (পর্তুগীজ ব্যবসায়ী) এ অঞ্চল হতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা বাইরে রপ্তানির বিষয় উলেণ্ঢখ করেছেন। সে সময় ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিলণ্ঢা, রাজশাহী, যশোহর ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যথেষ্ট তূলার চাষ হতো (ইসলাম ২০০০)। এ পর্যায়ে দুটি বিষয়ে মোটামুটি নিরাপদ মন্ড়ব্য করা যেতে পারে। প্রথমত, মুসলিম শাসনামলের পূর্বে কৃষি কাঁচামালের রপ্তানি যেমন বেড়ে যায়, তেমনি কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্প পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল প্রায়

অপরিবর্তিত একটি কৃষি কাঠামোর মধ্যে, কেননা মোগল কৃষি ব্যবস্থা আসলে পূর্ববর্তী তুর্কী-পাঠান ব্যবস্থারই অনুকরণ, আবার তুর্কী-পাঠান ব্যবস্থা সেন-পাল ব্যবস্থার অনুকরণ। তাই আর্যপূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম বাংলার সমাজে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হলেও অর্থনীতির কৃষি ভিত্তিকতা ছিল অক্ষুন্ন।

৪.১.২। কৃষি ও শিল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ছিল প্রাচীন এবং অনুন্নত

আর্য-পূর্ব বাংলার কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে THB ও বাঙ্গালীর ইতিহাস এর মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আর্যপূর্ব কালে বাংলায় একটি সমৃদ্ধ লাঙ্গল কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি বিরাজ করছিল (ইসলাম ২০১১)। অপরদিকে THB জানায় যে, 'এদের (আর্যপূর্ব বাংলার অধিবাসীদের) কৃষি ছিল অত্যন্ড় প্রাথমিক ধরনের। পাহাড়ের গায়ে লাঠি দিয়ে গর্ত করার মাধ্যমে এরা ফসল ফলাত।' অর্থাৎ আর্যপূর্ব বাংলার কৃষির মূল হাতিয়ার ছিল, THB-এর মতে, 'গর্ত করার জন্য লাঠি', লাঙল নয়। THB যাকে গর্ত করার জন্য লাঠিভিত্তিক কৃষি বলে আখ্যায়িত করেছে, ইতিহাসের আলোচনায় তাকে সাধারণত hoe-agriculture বলা হয়। বাংলায় একে বলা যেতে পারে 'খুন্ড়ি কৃষি'। THB-এর বক্তব্য অধিক যুক্তিসঙ্গত ধরে নিয়ে নজর"ল ইসলাম জানাচ্ছেন, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এবং সেই সূত্রে সমাজের ওপর অভিঘাতের দৃষ্টিকোণ থেকে লাঙল-পূর্ব কৃষির (অর্থাৎ খুন্ড়ি কৃষির) বদলে লাঙল কৃষির প্রবর্তন বর্তমানের পশু নির্ভর কৃষির বদলে ট্রাক্টর চালিত কৃষির প্রবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল। তবে কৃষি প্রযুক্তি পরবর্তী পর্যায়ে আর তেমন বিকশিত হয়নি, যার জন্য আবদুলণ্ঢাহ ফার"কের মন্ড়ব্যে হতাশা ঝরে পড়ে, 'আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিগত পাঁচশত বৎসরে কৃষকের ব্যবহৃত এই সকল যন্ত্রপাতির (গর"র দ্বারা চালিত লাঙল, কাস্ড়ে) কোনোই পরিবর্তন হয় নাই এবং আজ পর্যন্ড় শতকরা নব্বইটি কৃষকই এই পুরাতন যন্ত্রপাতির দ্বারাই জমির চাষ করিয়া থাকে। ইহা আমাদের জনসাধারণের উদ্ভাবনী শক্তির অভাবের একটি উদাহরণ' (ফার"ক ১৯৮৩)। আর এ সময় জুড়ে শিল্প পণ্যে বাংলার বিশ্ব জোড়া খ্যাতি থাকলেও তা ছিল মূলত হস্ড়শিল্প। স্বাভাবিকভাবেই হস্ড় শিল্পের প্রযুক্তি সমকালীন কৃষি প্রযুক্তির মতোই স্থবিরতায় আক্রান্ড় ছিল।

৪.১.৩। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা ছিল কম

দেশের মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশের কর্মসংস্থান যদি কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়, আর সে তুলনায় মোট জাতীয় উৎপাদনে তথা জিডিপি'তে যদি কৃষির অবদান কম থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে ঐ অর্থনীতির কৃষিখাতে ছদ্ম বেকারত্ব বিরাজমান। এই বিষয়টি বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে আবহমানকাল থেকেই সত্যি ছিল। অর্থাৎ প্রায় সব কালেই বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত থেকে মোট দেশজ উৎপাদনে (কর্মসংস্থানের তুলনায়) কম অবদান রেখেছে। সুতরাং কর্মসংস্থান-জিডিপি'র অনুপাতে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা আবহমানকাল থেকেই ছিল নিম্ন পর্যায়ের। এর পাশাপাশি কৃষিতে প্রযুক্তির বিকাশ না ঘটা, সেচের মতো ভারি কৃষি উপকরণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা, কৃষকদের বাজারের সাথে সংযোগহীনতা প্রাক-ঔপনিবেশিক কৃষির উৎপাদনশীলতা সীমিত রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে (ইসলাম ২০০০)। অপরদিকে যন্ত্রশিল্পের অনুপস্থিতিতে হস্ড়শিল্পভিত্তিক শিল্প অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা আটকে ছিল নিম্নস্ড়রে। একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণে শিল্প অর্থনীতির এই নিম্ন উৎপাদনশীলতা স্পষ্ঠ হয়ে উঠে। সারা মাস ধরে পুরো সকাল মাকুতে কাজ করার পরও একজন সুতা কাটার লোক সর্বোচ্চ মাত্র আধা তোলা পরিমাণ সুতা কাটতে পারতো। আর একটি সূক্ষ্মতম ধরনের মসলিনের অর্ধখ" বোনার জন্য একজন তাঁতীর প্রযোজনীয় পরিমাণ সুতা কাটতে লাগতো প্রায় দুই বছর। সমসাময়িক মজুর শ্রেণির মানুষের নিম্ন আয় ছিল কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির নিম্ন আয়ের প্রতিফলন।

৪.১.৪। কিছু শিল্প স্থাপিত হলেও অনুন্নত প্রযুক্তির দর"ন উৎপাদিকা ছিল সীমাবদ্ধ

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের আদি বাসিন্দারা শিল্পে ও কারিগরিতে দক্ষতা অর্জন করেছিল। প্রাচীনকালে এদেশের যে সকল শিল্প খ্যাতি লাভ করেছিল তার মধ্যে বস্ত্র, লবন, ধাতু, পাথর ও কাঠ খোদাই এবং মৃৎ শিল্প বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য। বাংলার সব রকম হস্ড়শিল্পের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র শিল্প ছিল সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ (ইসলাম ২০০০)। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের জনৈক লেখকের রচিত 'পেরিপাস অব দি এরিত্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থে, গাঙ্গিটিকি নামের যে মসলিনের উলেণ্ঢখ পাওয়া যায় তার উৎস সম্ভবত পূর্ববঙ্গে। রোমান সাম্রাজ্যের বিত্তশালী মহিলাদের কাছে ভারতীয় (তথা বাংলার) মসলিন ছিল গভীর অনুরাগের বস্ড়ু। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'ভঙ্গ' বা 'পূর্ব বঙ্গের মিহি কার্পাস বস্ত্রের উলেণ্ঢখ পাওয়া যায়। নবম শতকের আরব পরিব্রাজক সোলায়মান, ত্রয়োদশ শতকের ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলো, ষষ্টদশ শতকের র"লফ ফিৎস এবং পরবর্তীকালের ভ্রমণকারী বার্নিয়ার ও ট্যাভার্ণিয়ার সকলেই বাংলার তৈরি সস্ড়া, হালকা, জমকালো ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রশংসনীয় বর্ণনা দিয়েছেন। শিল্প পণ্য এবং রপ্তানি পণ্য হিসেবে বাংলার অর্থনীতিতে বস্ত্রের আধিপত্য প্রাক-ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ড় অব্যাহত ছিল-'আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে বাংলা হয়ে ওঠেছিল বিভিন্ন জাতের তুলা এবং সিল্কের তৈরি পণ্যের এক অসাধারণ ভা"ার। এ পণ্য শুধু মহান মোগলদের সাম্রাজ্য হিন্দুস্ড়ানেই ব্যবহৃত হতো না, এ পণ্য যেতো ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। এ পণ্যগুলো শুধু যে চমৎকার মসৃণতা এবং মিহি কার"কার্যের জন্যই খ্যাত ছিল তাই নয়, তুলনামূলকভাবে দামেও ছিল সস্ড়া। এভাবে প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার শিল্প অর্থনীতিকে সমকালীন যেকোনো উন্নত অর্থনীতির সাথে তুলনা করা যায়।' গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজত্বকালে বাংলায় রেশমের উৎপাদন শুর" হয়। রেশমের তৈরি কাপড় তখন ঢাকা, সোনারগাঁও এবং সপ্তগ্রামের মতো গুর"ত্বপূর্ণ শহরগুলোতে রপ্তানি করা হতো। মুসলিম বিজয়ের পর কিছু ধর্মীয় বিধিনিষেধের ফলে এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ড় হয় বটে, কিন্তু দ্র"ত এই শিল্পের পুনর"জ্জীবন ঘটে। চর্যাপদ, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল এবং পূর্ব বঙ্গ গীতিকার মতো প্রথম দিকের উপাখ্যানগুলোতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিশাল বিশাল নৌকা নির্মাণের উলেণ্ঢখ রয়েছে। বাংলার দীর্ঘ, গভীর, বিস্ড়ৃত উপকূল রেখা বরাবর লবন উৎপন্ন হতো। যেহেতু কৃষি ছিল প্রাচীনকালে এই দেশের প্রধান পেশা, সেহেতু অনুমান করা যায় যে, কর্মকার ও ধাতুশিল্প প্রস্ড়ুতকারক একটি শ্রেণিও এখানে ছিল। ধনীর বিলাসের জন্য শহরে অলঙ্কার নির্মাণের শিল্প প্রাচীনকাল হতে বিদ্যমান ছিল। কাঠের কার"কার্যের নিদর্শন যদিও কালস্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তারপরও এমন কিছু কিছু প্রমাণ আছে যাতে বোঝা যায় যে মন্দির, বাড়ি, আসবাবপত্র, নৌকা, জাহাজ, গর"র গাড়ি ইত্যাদি প্রস্ড়ুতের শিল্প সেকালে বিদ্যমান ছিল (ফার"ক ১৯৮৩) । সব মিলিয়ে বলা যায়, এ সময় বাংলার শিল্প ভিত্তি সংকীর্ণ ছিল না। তবে অনুন্নত প্রযুক্তির দর"ন উৎপাদন শক্তি ছিল সীমিত, যা ইতোপূর্বেই উলেণ্ঢখিত হয়েছে।

৪.১.৫। সমাজ ছিল শ্রেণিবিভক্ত এবং ক্ষমতা ছিল কেন্দ্রীভূত

বাংলাদেশে আর্যপূর্ব সমাজ শ্রেণিবিভক্ত ছিল কিনা তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া না গেলেও বাংলায় আর্যকরণের মূল আর্থসামাজিক প্রতিফল যে ছিল বর্ণ প্রথার (তথা শ্রেণি বিভাজন) বিস্ড়ার সে বিষয়ে নি:সন্দেহ হয়ে THB আমাদের জানাচ্ছে, 'আর্যকরণের অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই অঞ্চলের পূর্বতন অধিবাসীদের আর্য সমাজকাঠামোর মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত করার প্রয়াস। তারই প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন আদিবাসী কৌম (tribe) যেমন ভর্গ, সবর, পুলিন্ড, কিরাত, পুন্ড্র প্রভৃতিকে প্রাচীন উপাখ্যানে ক্ষত্রিয় হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হচ্ছে। বাংলার কিছু মানুষকে যে ব্রাহ্মণ হিসেবে উচ্চ শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ..... স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশকে শেষাবধি শূদ্র শ্রেণিভুক্ত করা হয় (ইসলাম ২০১১)। THB আরও জানায় যে, সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের 'অস্পৃশ্য' বা 'ম্লেচ্ছ' দের (যাদেরকে মূল সমাজের বাইরে ভাবা হতো) বাদ দিয়েও উপবর্ণের সংখ্যা ছিল বিপুল এবং তাদের মধ্যে আবার উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন- এই তিন শ্রেণি চিহ্নিত করা সম্ভব। এই শ্রেণি বিভক্তি

একচেটিয়াভাবে বিরাজমান ছিল হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ড়, মুসলিম আমলে এসে এর সাথে যুক্ত হয় মুসলমান সমাজের শ্রেণি বিভাজন। ঐতিহাসিক আব্দুল করিম (১৯৫৯, ১৯৬০) মুসলিম শাসকদের এবং হিন্দু সাধারণ্যে প্রচলিত, উভয় সূত্রের আকর বিশেণ্ডষণ করে এই উপসংহারে উপনীত হন যে, বাংলার মুসলিম সমাজও সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল- উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণি। তিনি আরও জানান যে, এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত মুসলিম সমাজ পরবর্তীতে চার শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন- 'আশরাফ' (সম্ভ্রান্ড়), 'আতরাফ ভালো মানুষ' (মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক), 'আতরাফ' (মধ্যবিত্ত) এবং আরজাল (নিম্ন শ্রেণি)। মুসলিম শাসনামলের শেষ দিকেও সামাজিক স্ড়রবিন্যাস ছিল প্রকট।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কোনো অভিপ্রায় শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। রাজস্ব প্রশাসন ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অন্য কোনো শাখার বিস্ড়ারও তৃণমূল পর্যন্ড় প্রসারিত ছিল না। আর মার্কস কথিত এশিয়াটিক সমাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলার গ্রামগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন, অন্ড়ত সেই অর্থে স্বনির্ভর, তাই গ্রামীণ বাংলার পক্ষ থেকেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কোনো কার্যকর চাহিদা ছিল না।

৪.১.৬। ক্ষমতায় জমির মালিকদের প্রভাব ছিল নিরঙ্কুশ

আর্যপূর্ব বাংলায় সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষে কারা ছিল বা আদৌ ছিল কিনা- এ ব্যাপারে স্পষ্ট উপসংহার টানা যায়নি; বরং ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে, গ্রামভিত্তিক সমাজে এক ধরনের সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল যেখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অনুপস্থিত। আর্যদের আগমনের পর স্থানীয় জনগোষ্ঠী নতুন সমাজের নিম্নবর্গে অবস্থান নেয় যেহেতু আর্য প্রবর্তিত অর্থনীতি ও সংস্কৃতি উন্নততর স্ড়রের ছিল (ইসলাম ২০১১)। এদিকে আর্য সমাজেও জমির ব্যক্তিগত বা শ্রেণিগত মালিকানার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে আর্য-পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্রাট ও রাজাদের শাসনামলে সম্রাট বা রাজারাই ছিলেন রাজ্যের সকল জমির মালিক। প্রজারা 'রায়ত' হিসেবে সম্রাট বা রাজার জমিতে চাষাবাদ করতো এবং উৎপাদনের একটি অংশ তাদেরকে খাজনা হিসেবে পরিশোধ করতো। অর্থাৎ এ সময় (রাজনৈতিক) ক্ষমতায় জমির মালিকদেরই (সম্রাট বা রাজার) একচ্ছত্র প্রভাব ছিল।

রস্টো সনাতন সমাজের যে সকল নির্দেশকের উলেণ্ডখ করেছেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের 'সনাতন সমাজ' পর্বে সে সকল বৈশিষ্ট্যের প্রায় পরিপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে এ সকল বৈশিষ্ট্যের বেশ কিছু পরবর্তী বহুকাল ধরেই বিদ্যমান ছিল এবং কিছু কিছু এখনও বিরাজমান রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও কৃষিভিত্তিক, যদিও বিগত দুই দশকে জিডিপি'তে কৃষির অবদান উলেণ্ডখযোগ্য মাত্রায় কমেছে। কৃষি ও শিল্প খাতে উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাবও বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। শিল্প ভিত্তি ধীরে ধীরে প্রসারিত হলেও কয়েক দশক আগেও জিডিপিতে শিল্পের অবদান ছিল নগণ্য। রস্টো বর্ণিত সনাতন সমাজের স্ড়র পেরিয়ে আসার পরও বহু কাল দেশীয় অর্থনীতি নিম্ন উৎপাদনশীলতা দ্বারা আক্রান্ড় ছিল, যার দর্ন বিংশ শতাব্দীর আশির দশকেও অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার শতকরা চার ভাগ অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। যদিও পরবর্তীতে নব্বই দশকে ৪ ভাগ অতিক্রম করে একবিংশ শতকের প্রথম দশকে ৫-৬ ভাগের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, তবুও সমাজের শ্রেণি বিভাজন কমেনি, ক্ষমতাও কুক্ষিগত রয়েছে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণির হাতে। ক্ষমতায় জমির মালিকদের নিরঙ্কুশ প্রভাবে হয়ত কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, কারণ ক্ষমতার বলয়ে জমি ছাড়াও নতুন নতুন নির্ধারকের আবির্ভাব ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি রস্টোর 'সনাতন সমাজ' অতিক্রম করে এসেও সেই সমাজের আদিমতার নির্দেশকগুলো যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে, হয়তো মাত্রা কমেছে, কিন্তু উপস্থিতি হারিয়ে যায়নি।

৪.২। উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা

রস্টোর মতে, অর্থনীতির উড্ডয়নের পূর্বাবস্থায় সমাজে কিছু মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে। সনাতন সমাজের সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে এ ধরনের পরিবর্তন আসে (ইসলাম ২০১০)। আপাতদৃষ্টিতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃটিশদের হস্ড়গত হওয়ার পর থেকেই এ অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে রস্টো বর্ণিত মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে, এর পেছনে ছিল সমসাময়িক বৃটিশ শিল্প বিপণ্ডব ও ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাব যা নাগরিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি অধিকার ও গণতন্ত্রের ওপর গুর"ত্বারোপ করেছিল। তবে গবেষকদের একটি অংশ এই পরিবর্তনের পরিণতি ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক এবং উপনিবেশের স্বার্থের চেয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে গিয়েছে বলে অভিমত দেন। এম এম আকাশ বলেন, 'ঔপনিবেশিক ধ্বংসলীলার বিপুল সমারোহের মাঝে প্রথমবারের মতো আধুনিক ইতিবাচক উপাদানগুলো উঁকি মারতে শুর" করে।' তার মতে, ব্রিটিশদের নিজেদের প্রয়োজনেই রেললাইন, বিদ্যুৎ, রাস্ড়াঘাট, স্টিমার ইত্যাদির প্রচলন হলেও এসকল উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সূত্র ধরেই এদেশে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল (আকাশ ২০০৪)। আর পাকিস্ড়ান অর্জনের পর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে রস্টো বর্ণিত পরিবর্তনের গতি আরও বেগবান হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বাঙালি জাতীয় চেতনার বিকাশের ইতিহাসে আঠারো শতকের মধ্যভাগ (বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা) হতে বিশ শতকের সত্তরের দশক (স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান) পর্যন্ড় সময়কাল— যা 'উড্ডয়নের পূর্বাবস্থা' স্ড়রের বিশেণ্ডষণের আওতাধীন— বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ। সেই সময়ের সম্ভাবনা ছিল দেশীয় অর্থনীতির জন্য একটি ক্রান্ড়িকাল হওয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্ণ ঔপনিবেশিক (ব্রিটিশ শাসন) ও দুই দশকের বেশি আধা ঔপনিবেশিক (পাকিস্ড়ানি শাসন) শোষণে বাংলার অর্থনীতির সেই সম্ভাবনা (স্বয়ংচালিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করা) কিভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় তা পরবর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আলোচনার পরিসর বিবেচনায়, নিম্নের বিশেণ্ডষণে পাকিস্ড়ান পর্বের ওপর খুব একটা আলোকপাত করা হয়নি। কারণ প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফলের দিক থেকে আধা ঔপনিবেশিক এই শাসনকালটি অব্যবহিত পূর্বের পূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসনামলের এক ধরনের পুনরাবৃত্তি। ফলে এই অনালোকপাত সংশিণ্ডষ্ট উপসংহারের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে ধরে নেওয়া যায়।

৪.২.১। আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকা"ের উপযোগী শিক্ষার প্রসার ঘটা

বাংলায় আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মকা"ের প্রসার কোম্পানি আমলে যতটুকু বিদ্যমান ছিল, স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানি পরবর্তী শাসনামলে তা বৃদ্ধি পায়। এসকল কর্মকা" যথা ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, অফিস, এজেন্সি প্রভৃতি পরিচালনার জন্য একদল শিক্ষিত লোকের দরকার হয়। ইতিমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড়ের মাধ্যমে ব্রিটিশরা বাংলায় তাদের অনুগত এক অনুৎপাদনশীল ভূস্বামী শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষার বিস্ড়ারের মাধ্যমে এদেশে আরেকটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা স্ড়র গড়ে তোলা হয়। তবে এই নতুন সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি বৃহত্তর পরিণত ও সচেতন অংশ, অন্যদিকে রাজ্যহারা ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত মুসলমানরা অভিমানে ইংরেজি শিক্ষা নিতে অস্বীকার করে দূরে সরে থাকে (রাজকূট ২০১০)। এই সময় হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উলেণ্ডখিত হিন্দু সমাজের সন্ড়ানেরাই ইংরেজি পাঠে মনোনিবেশ করেছিল। এরাই পরে বংশানুক্রমে এক সুশিক্ষিত আমলা ও পেশাজীবি মধ্যস্ড়রের জন্ম দিয়েছিল, যারা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শিক্ষিত কর্মচারীর (Officer) চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রেখেছিল। তবে এটাও ঠিক যে ঔপনিবেশিক শক্তি সহজে এদেশে শিক্ষা দান করতে চায়নি। আঠার শতকের শেষে যখন ভারতে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের প্রশ্ন উঠে, তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা এই বলে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, লেখাপড়া শেখানোর ফলে আমেরিকার মতো কলোনি

তারা হারিয়েছেন, ভারতে আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চান না। ১৮১৩ সালে কোম্পানি সর্বপ্রথম ভারতে শিক্ষা বিস্ড়ারে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি পায়। ইংরেজ শাসকেরা এদেশে যে শিক্ষা প্রণালী উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন তারই বিবর্তিত রূপকে আমরা সাধারণ শিক্ষা বলি (আনিসুজ্জামান ২০০০)। সাধারণ ধারার শিক্ষা যারা (ম্যাকলে তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য) প্রবর্তন করেছিলেন, তারা ভেবেছিলেন এই শিক্ষা ফিল্টারের প্রণালীর মতো চুইয়ে চুইয়ে পৌঁছে যাবে সমাজের উঁচু স্ড়র থেকে নিচু স্ড়র পর্যন্ড়। স্পষ্টতই পরবর্তী দেড়শ বছরেও তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। তারপরও বহু নিন্দিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমন সব মানুষ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, নানা ক্ষেত্রে যাদের অবদানে এ দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে।

৪.২.২। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুবিধার জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার সৃষ্টি

মোগল আমলে বাংলার ক্রমসম্প্রসারণশীল রপ্তানি বাণিজ্য ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে টাকা পয়সা লেনদেনের চাহিদা বৃদ্ধি ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে (ইসলাম ২০০০)। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত এবং আব্বাসিয় যুগে আরবদের প্রবর্তিত ব্যাংক ব্যবস্থার সমন্বয়ে বাংলার ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আঠারো শতকে বাংলার নবাবদের সময়ে দেশীয় ব্যাংকাররা মুদ্রা এবং সরকারি অর্থের উপর যে প্রভাব অর্জন করেছিল তা ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকেও অটুট ছিল। ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পরও গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণিটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন একটি সাধারণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং তৎপরতা শুর" করে তখন দেশীয় ব্যাংকগুলো বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৭৭৩ সালের ১৩ এপ্রিল বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিকল্পনার ফলে বাংলা ও বিহারে সাধারণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় বিলের মাধ্যমে রাজস্ব প্রেরণ করে বাংলার গ্রামাঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন অটুট রাখা এবং ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে আড়ংসমূহে ব্যবসায়ীদের জন্য টাকা প্রেরণের সহজ ও সস্ড়া উপায় সৃষ্টি করে দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করা। বর্তমান বাংলাদেশের ভূখ"ে সর্বপ্রথম ব্যাংকনোট প্রচলিত হয় সম্ভবত ১৭৮৫ সালে। বেঙ্গল ব্যাংকের স্বত্বাধিকারী জ্যাকব রাইডার ও এডওয়ার্ড হে'র স্বাক্ষরযুক্ত ১০০, ৫০০ ও ১ মোহরের নোট ঐ বছরই প্রচলিত হয়েছিল (ফার"ক ১৯৮৩)।

১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানে (বর্তমান বাংলাদেশে) বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১১টি অফিস ছিল, যার বেশিরভাগই ছিল ভারতীয় বা বিদেশী কোনো ব্যাংকের শাখা। ক্রমশ ভারতীয় ব্যাংকগুলো নিজেদের ব্যবসা তুলে নেয় ও পাকিস্ড়ানের (তথা পূর্ব বাংলার) নিজস্ব ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ব্যাংকের সংখ্যা ও শাখা বাড়তে থাকে। ১৯৬৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ানে মোট বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ছিল ৩৬৯টি, ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৩৭টিতে।

৪.২.৩। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটা

১৭৬৫ সালে কোম্পানির 'দেওয়ানি' প্রাপ্তির সময় থেকে মধ্য উনিশ শতক পর্যন্ড় অর্থাৎ কোম্পানির শাসনামলের শেষ পর্যন্ড় বাংলার অভ্যন্ড়রীণ ও বহির্বাণিজ্য বেশ বৃদ্ধি পায়। এসময় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে প্রচুর কৃষি পণ্যের বেচাকেনা হতো। আগে থেকেই বিদ্যমান বাংলার আদি বণিক শ্রেণির সাথে যুক্ত হয় বিদেশী বিশেষ করে ইংরেজ বণিক (ইসলাম ২০০০)। আঠার শতকের মাঝামাঝি বাংলার নগরগুলো ছিল ব্যবসা বাণিজ্য বা প্রশাসনের কেন্দ্র তথা পীঠস্থান। নগরে বাস করত অধিকসংখ্যক কারিগর, যাদের পাশেই অবস্থান ছিল ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারের। ঢাকার গুর"ত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল উনিশ শতকের অনেক আগে থেকেই। এসময় ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহরগুলো বিশেষ করে বেনারস থেকে মহাজনেরা বাংলাদেশে বেশ ব্যবসা করেছে।

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ থেকে চিনি, শস্য ও কাপড়ের রপ্তানি বেশ বৃদ্ধি পায়। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে বাস করত এমন কিছু কারিগর, যারা রপ্তানির জন্য বয়ন করত উন্নতমানের সুতি ও রেশমী কাপড়। আঠার শতকের প্রথমার্ধেই নিজেদের নৈপূণ্যের ফলে এই বয়নশিল্পীরা বিশ্বজোড়া বাজার দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। ফলে বাংলাদেশের সুতায় তৈরি বস্ত্র সামগ্রীর রপ্তানি ১৭৬৫ সাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ড় উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। আঠারো শতকের বেশির ভাগ সময় বাংলাদেশের পণ্য আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে কম ছিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮১২ এর মধ্যে এই পরিমাণ ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। ১৮১৩-এর পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ বেশ বাড়লেও ১৮৪০-এর দশকের আগে এটি শতকরা পঞ্চাশ ভাগের ওপর যায়নি। বাংলার অর্থনীতিতে তখন যুগান্ড়র সাধিত হচ্ছে। দেশীয় অর্থনীতিতে এসময় রপ্তানিকারক থেকে আমদানিকারকে রূপান্ড়রিত হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। কোম্পানির আমল শেষ হওয়ার আগেই এদেশ বৃটিশ শিল্প পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, রপ্তানির মধ্যে থাকে শুধু কিছু কৃষি কাঁচামাল। ১৮১৫ সাল নাগাদ ব্রিটেনের বাজারের একটি বড় অংশ বাংলার সুতি বস্ত্রের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর পর বন্ধ হয়ে যায় ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বাজারসমূহ। এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বয়নশিল্প, রেশম এবং লবনের উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এ সকল স্থানীয় উদ্যোগও ব্যর্থ হয়ে যায় (ইসলাম ২০০০)।

৪.২.৪। আধুনিক শিল্পের বিকাশ

পূর্ববর্তী স্ড়র অর্থাৎ সনাতন সমাজের আলোচনা থেকে এটা সহজেই বলা যায়, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের আগেই বাংলায় একটি সমৃদ্ধ শিল্প ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। যদিও তা ছিল হস্ড় শিল্প, তবে কালক্রমে সেটারই যন্ত্র শিল্পের রূপান্ড়রের সম্ভাবনা ছিল। গবেষকদের কেউ কেউ এমন মতও দেন, সেক্ষেত্রে প্রথম শিল্প বিপণ্ঢব ব্রিটেনে না হয়ে, বাংলা তথা ভারতবর্ষেই হতো। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে কিভাবে বাংলার সমৃদ্ধ শিল্প খাত ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড়ে প্রায় হারিয়ে গেল।

তাঁত শিল্প

বাংলার হস্ড়চালিত তাঁতভিত্তিক সুতীবস্ত্র শিল্প ছিল সারা দেশে বিস্ড়ৃত। রবার্ট ওরমে এ সম্পর্কে বলেন, 'বাংলায় সদর রাস্ড়া বা কোনো প্রধান শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এমন কোনো গ্রাম পাওয়া কঠিন ছিল, যেখানে প্রত্যেক নারী, পুর"ষ এবং বালক-বালিকা একখ" কাপড় তৈরিতে নিয়োজিত নেই' (ইসলাম ২০০০)। ১৭৭৬ সালের এক হিসাবে দেখা যায় শুধু ঢাকা জেলাতেই বস্ত্রবয়ন শিল্পে জড়িত ছিল ১,৪৬,৭৫১ জন। ১৮২৫ সালে কোম্পানি যখন তার ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে সেই সময় সংশিণ্ঢষ্ট তাঁতী, তুলা উৎপাদক, তন্তুবায়, ড্রেসার এবং নকশাকারের সংখ্যা, বোর্ড অফ ট্রেডের হিসাব মতে, দাঁড়ায় ৫ লাখে। যেহেতু ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রদেশের তাঁতকলের মাত্র শতকরা ৩৩ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো, ১৮২৫ সাল নাগাদ এ অঞ্চলের ১.৫ মিলিয়ন লোক সুতীবস্ত্র উৎপাদনে সরাসরি নিয়োজিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। সেসময় বাংলাদেশে মোট কি পরিমাণ সুতীবস্ত্র উৎপাদিত হতো তার কোনো হিসাব পাওয়া না গেলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতের বাইরে বস্ত্র রপ্তানির কিছু খ" তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, ঢাকার আড়ংগুলো থেকে ১৭৪৭ সালে কার্পাসের তৈরি যেসব পণ্য রপ্তানি হয়, তার বার্ষিক মূল্য ছিল সাড়ে আটাশ লাখ টাকা। ১৭৮৭ সালে এই অঙ্ক বেড়ে হয় ৫০ লাখ টাকা। বাংলায় তাঁতভিত্তিক তুলাজাত বয়ন শিল্পের অবনতির অনেকগুলো কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, শারীরিক নির্যাতন, জরিমানা, পণ্যের জন্য হয়রানি, সম্পত্তি দখল ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানি অর্থ আদায় করতো। এর ফলে অনেক তাঁতী তাদের পেশা পরিত্যাগ করেছিল। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন ব্রিটিশ রাজস্বনীতিও এই শিল্পের অবনতির জন্য দায়ী ছিল। ব্রিটেনের সুউচ্চ শুল্ক প্রাচীর বস্ত্র পণ্যের

রপ্তানিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, আঠারো শতকের শেষার্ধের ব্রিটিশ শিল্প বিপণ্ডব বাংলার তুলাজাত পণ্যের উপর সবচেয়ে কঠোর আঘাত হানে। ফলে ব্রিটেনের তৈরি বস্ত্র পণ্যের বাজারমূল্য এত কমে যায় যে, বাংলা থেকে বস্ত্র পণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থত, অভ্যন্ড়রীণ শুল্ক ব্যবস্থাও বাংলার তুলাজাত বয়নশিল্পের অবনতিকে ত্বরান্বিত করে। পঞ্চমত, স্থানীয় বস্ত্র উৎপাদকদের বহুকালের পৃষ্ঠপোষক অভিজাত ও বড় জমিদার পরিবারগুলোর পতন এই শিল্পের অবক্ষয়ের আরেকটি কারণ। বিদেশি পণ্যের প্রতি স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির তীব্র আকর্ষণও এদেশে বিলেতি পণ্যের প্রসারে সাহায্য করে। এভাবে তুলাজাত বয়নশিল্প শুধু বিদেশি বাজারই হারায়নি, বরং ১৮১৩-১৪ সাল থেকে ব্রিটেনের বস্ত্র পণ্যের আগ্রাসনে নিজের বাজারও হারায়। ১৮২৪ সাল থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই লাখ লাখ সুতা কাটার লোক বেকার হয়ে পড়ে, তাদের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্দশা। যা দেখে তৎকালীন গভর্নর জেনারেলও মন্ড়ব্য করেন, 'ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাসে এ ধরনের দুর্দশার কোনো নজির নেই। তুলাজাত পণ্য উৎপাদনকারী তাঁতীদের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হচ্ছে।' যেসব তাঁতী এরপরও এই পেশা চালিয়ে যায়, তারা স্থানীয় মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ে। কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো কাঁচামাল (যেমন, সুতা) কেনার জন্য একজন কার"শিল্পীর যে শুধু সচল মূলধনের প্রয়োজন ছিল তা নয়, সংরক্ষিত মূলধনেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ উৎপাদিত পণ্য বাজারের অভাবে প্রায়ই অবিক্রীত পড়ে থাকতো, বিশেষ করে যখন চাহিদা ছিল কম। অথচ এ সময়ও তাঁতীকে কাজে লিপ্ত থাকার জন্য সুতা কিনতে হতো। এই পুরো প্রক্রিয়ায় তাঁতীরা মহাজনের সাথে প্রতিকূল চুক্তিতে আবদ্ধ হতো, যেখানে কেনাবেচা থেকে যে লাভ হতো মহাজনেরা তার পুরোটাই নিজেরাই গ্রহণ করতো আর তাঁতীরা পেতো ভরণপোষণের জন্য কিছু অর্থ। এভাবে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ড় এ শিল্প (যতটুকু অবশিষ্ট ছিল) সাধারণভাবে মহাজনদের খপ্পরেই থেকে যায়।

রেশম শিল্প

দীর্ঘকাল ধরে বাংলা থেকে কোরা নামে এক ধরনের রেশমী পণ্য রপ্তানি করা হতো (ইসলাম ২০০০)। এগুলো ব্রিটেনে আমদানি করা হতো প্রধানত ছাপানোর জন্য এবং পরে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে রপ্তানি করার লক্ষ্যে। আসামের মুগা রেশম দিয়ে ঢাকায় কাসিদা নামের নকশা করা মসলিন বয়ন করা হতো, যা আরব ও তুরস্কের লোকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল। রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পরিশোধিত তুলা এবং আসামের রেশম দিয়ে ঢাকায় আজিজি নামের বাফতা বস্ত্র উৎপাদন করা হতো। এই বস্ত্র রপ্তানি করা হতো এবং ইহুদিরা তা পরিধান করতো। ১৮৯০ সাল নাগাদ এই বস্ত্রের বয়ন বেশ কমে আসে। বিদেশে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত বস্ত্র ছাড়াও দেশে বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের বেশ চাহিদা ছিল। খুব দ্র"ত রেশম শিল্পের অবক্ষয় ঘটে। যেখানে ১৯০১ সালে বাংলায় রেশম সুতা কাটায় ও বয়নে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ৫০,৩৯৩ জন, সেখানে ১৯২১ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ১৩,৫৮৭ জনে। রেশম শিল্পের অবনতির অনেকগুলো কারণের একটি হচ্ছে গুটিপোকার ওপর অত্যন্ড় বিষাক্ত ও সংক্রামক ব্যধির আক্রমণ। ব্রিটেনে ধার্য অসম শুল্ক এদেশের রেশম শিল্পের অচল হয়ে পড়ার আরেকটি কারণ। ভারতে আনীত বৃটেনে উৎপাদিত রেশম সামগ্রীর জন্য যেখানে কর দিতে হতো শতকরা ৩.৫ ভাগ, সেখানে ভারত থেকে ব্রিটেনে আমদানিকৃত রেশম সামগ্রীর জন্য কর দিতে হতো শতকরা ২০ ভাগ বা তারও বেশি। বাংলায় উৎপন্ন রেশমের দোষত্র"টিও এর অবনতির অন্যতম কারণ। ইউরোপীয় ফার্মগুলো বাংলায় কাঁচা রেশমের ক্ষেত্রে অর্থলগ্নিকারি, শিল্পপতি ও বাজারজাতকারীর ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু তাদের ব্যবসা প্রত্যাহারের ফলে বাংলার রেশম শিল্পটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

আঠারো শতকের শেষ দিকে বাংলায় জাহাজ নির্মাণে নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি এ ব্যাপারে সপ্রশংস মন্ড়ব্য করেন, 'বাংলায় ইতিমধ্যেই জাহাজ

নির্মাণ কৌশল উৎকর্ষের যে পর্যায়ে পৌঁছেছে (আরও দ্র"ত উন্নতির সম্ভাবনাপূর্ণ এবং কাঠের প্রচুর ও ক্রমবর্ধমান সরবরাহের দ্বারা মদদপুষ্ঠ), তা থেকে এটা নিশ্চিত যে, সব সময়েই এ অঞ্চলের বেসরকারি বৃটিশ বণিকদের মালামাল লন্ডন বন্দর পর্যন্ড় বহন করার মতো প্রয়োজনীয় ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের যোগান দিতে পারবে' (ইসলাম ২০০০)। যেসব অঞ্চলের সাথে বাংলার সুবিস্ড়ৃত সীমারেখা রয়েছে, সেসব অঞ্চল হতে ভালো কাঠের সরবরাহ ছিল প্রচুর। খুব সস্ড়া দরে প্রচুর সংখ্যক স্থানীয় কারিগর এবং শ্রমিক সহজলভ্য ছিল। এ দেশের সমসাময়িক সম্প্রসারণশীল আঞ্চলিক ও উপকূলীয় বাণিজ্যও শিল্পটিকে উৎসাহিত করে। মুনাফার উচ্চহারের জন্যও শিল্পটির বিকাশ ঘটে। তবে শিল্পটির বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এই শিল্প কখনোই ভালভাবে বিকশিত হতে পারতো না। উনিশ শতকেই এ অঞ্চলের বেসরকারি জাহাজের মালিকদের হাত থেকে নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্য রক্ষার জন্য ব্রিটিশ জাহাজ মালিকেরা একটি সুসংঘবদ্ধ পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। ব্রিটিশ সরকার এই স্বার্থগোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং ভারতের সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক কর্মকা"ে তাদের অংশগ্রহণের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ আইন, রীতিনীতি ও বিধিবিধান পাশ করে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলার জাহাজ শিল্প চূড়ান্ড়ভাবে ব্রিটেনের জাহাজ শিল্পের কাছে পরাজিত হয়।

অন্যান্য শিল্প

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হাতে বানানো কাগজ শিল্প সিরাজগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে বেশ চালু অবস্থাতে ছিল (ফার"ক ১৯৮৩)। বিশ শতকের গোড়ার দিকে যান্ত্রিক শিল্পে প্রস্ড়ুত কাগজের সাথে টিকতে না পেরে স্থানীয় কাগজ শিল্প পূর্ব বাংলায় প্রায় নি:শেষ হয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশের নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলে গড়ে প্রতি বছর ১৪ লাখ মন লবন উৎপন্ন হতো। তবে এর পর পরই মাদ্রাজে প্রস্ড়ুত লবনের সাথে মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাংলার লবনশিল্পে এক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্ড়ান সৃষ্টির প্রাক্কালে বাংলাদেশে লবন শিল্প প্রায় ছিল না বললেই চলে। তবে এর পরই বাংলাদেশে লবন শিল্প পুনরায় সংগঠিত হতে থাকে এবং পাকিস্ড়ান আমলের শেষদিকে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বিতীয় স্ড়রে তথা উড্ডয়নের পূর্বাবস্থায় রস্টো যে সামাজিক পরিবর্তনের চিন্ড়া করেছেন সেই পরিবর্তন সূচিত হবার পেছনে গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখে সামাজিক মূলধন (যেমন, রেলপথ, রাস্ড়াঘাট ইত্যাদি) সৃষ্টি; রস্টোর এই ধারণার সাথে মিল পাওয়া যায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী স্বল্পায়ু পাকিস্ড়ানি আধা-ঔপনিবেশিক শাসনামলের সাথে। রস্টো মনে করেন উড্ডয়ন পূর্বাবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে শুর" করে। বাংলাদেশে উলেণ্ডখিত সময়ের বিভিন্ন পর্বে (বিশেষত ব্রিটিশ শাসনামলে) আমরা দেখি জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, তবে যতটা না মানুষের সচেতনতার কারণে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি দুর্ভিক্ষে, অনাহারে। তবে প্রাক-উড্ডয়ন স্ড়রে রস্টো অর্থনীতির যে কাঠামোগত পরিবর্তনের উলেণ্ডখ করেছেন অর্থাৎ কৃষির তুলনায় শিল্পের অধিকতর গুর"ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা, সেটি বাংলার সমকালীন অর্থনীতির ক্ষেত্রে সঠিক হিসেবে প্রমাণিত হয়নি। এক্ষেত্রে রস্টোর সরল ব্যাখ্যাটি ছিল এমন, এই পর্বে ভোগে ব্যয়ের পর আয়ের যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকে তা ক্রমে সমাজের বিনিয়োগকারী শ্রেণির হাতে স্থানান্ড়রিত হতে থাকে (ইসলাম ২০১০)। ফলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের হার বাড়তে থাকে। পাশাপাশি মানুষের ধ্যানধারণায় পরিবর্তন ঘটে; শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। বিনিয়োগ এবং মানবসম্পদ, দুটোই যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মোট উৎপাদনে কৃষির অংশ কমতে থাকে এবং শিল্পের অংশ বাড়তে থাকে। রস্টোর এই কাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়াটি বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হতে পারেনি মূলত রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ থাকায়। ব্যয় অতিরিক্ত আয়ের উদ্বৃত্ত পর্যাপ্ত আকারে বাড়ার সুযোগ পায়নি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। মানুষের ধ্যানধারণায় পরিবর্তন এসেছে স্বাভাবিক নিয়মে, ধীর লয়ে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণের কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি

হয়েছে, তাও মন্থর গতিতে। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাংলার শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ 'বিলেত ফেরত' এর তকমাধারীও হয়েছেন; তবে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ গড়ে ওঠেনি। কারণ সেই রাষ্ট্রের উদাসীনতা, ক্ষেত্র বিশেষে অনাগ্রহ। অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বরং বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমনটা আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছি ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও সম্ভাবনাময় শিল্পখাতের বিকাশ অবরুদ্ধ করার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। একই প্রবণতা অব্যাহত ছিল পাকিস্তান পর্বেও। যার ফলে, রস্টোর তত্ত্বানুযায়ী, প্রাক-উড্ডয়ন পর্বে বাংলার অর্থনীতিতে শিল্প গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে গড়ে ওঠেনি। কৃষিতেও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। ফলে খাদ্য ঘাটতি ছিল অনিবার্য বাস্তবতা। পরিশেষে বলা যায়, উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার শর্তানুযায়ী সেই সময় বাংলার অর্থনীতির জন্য ক্রান্তিকাল হয়নি এবং বাংলার অর্থনীতি স্বয়ংচালিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও অর্জন করতে পারেনি।

৪.৩। উড্ডয়নকাল

টেক অফ বা উড্ডয়ন স্তরে পৌঁছার জন্য একটি অর্থনীতির বিশেষ 'উদ্দীপনা'র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন রস্টো। তার মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিক গতিতে চলাকালে কোনো একটি বিশেষ 'উদ্দীপনা' পেলে তাদের গতি ত্বরান্বিত হয়। উদাহরণ হিসেবে রস্টো উল্লেখ করেন উনিশ শতকে জাপানের মেইজি পুনর্জাগরণ এবং বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা ও চীনের বিপ্লব। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এরকম একটি 'রাজনৈতিক উদ্দীপনা' ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। সেই হিরন্ময় সময়ের তাৎপর্য ফুটে ওঠে আনিসুর রহমানের লেখায়, 'অনেক শতাব্দীর সংগ্রামের পর বাঙালি এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে বিশ্বের দরবারে তার নিজের পরিচয় দেবার জন্য। চারদিকে স্বাধীনতার উত্তেজনা, মানুষের চোখে মুখে এক অসাধারণ দীপ্তি, বিজয়গর্বে উন্নতবক্ষ মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।.....'সাত কোটি সন্তান' আজ আর 'বাঙালি' নেই, তারা মানুষ হয়েছে। মানুষ হয়ে এগিয়ে চলবার পথ খুঁজছে' (রহমান ২০০৪)। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর এই 'এগিয়ে চলবার পথ খোঁজা' ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির অন্বেষণ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের টেক-অফ স্তর পরীক্ষা করার জন্য আমরা যে কাল পর্ব পরীক্ষা করার জন্য নিয়েছি, সেই সময়কালের একেবারে শেষ প্রান্তে আরেকটি বিশেষ উদ্দীপনা (যদিও ব্যাপ্তিতে ও পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের তুলনায় অনেক সীমিত) ছিল দীর্ঘ দেড় দশকের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নব্বই এর 'গণ অভ্যুত্থান', যার মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ঘটে। রস্টো উড্ডয়ন স্তরের সময়কাল হিসেবে দুই দশকের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির উড্ডয়নকাল হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই দশকের অর্থনৈতিক বিকাশকালকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, উড্ডয়ন স্তরের তিনটি শর্তের আলোকে।

৪.৩.১। উৎপাদনশীল বিনিয়োগের হার বেড়ে মোট জাতীয় আয়ের ১০% বা তার উপরে ওঠা

রস্টো এখানে 'উৎপাদনশীল বিনিয়োগ' বলতে কৃষি বহির্ভূত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগকেই নির্দেশ করেছেন বলেই মনে হয়। কেননা কৃষি খাতকে বিবেচনায় নিলে একটি অনুন্নত অর্থনীতিতেও সামগ্রিক বিনিয়োগের হার দশ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে, যেহেতু এ ধরনের অর্থনীতিতে কৃষি খাত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিখাত হিসেবে বিদ্যমান। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সত্তরের দশকে সরকারি বিনিয়োগই ছিল মুখ্য ভূমিকায়, বেসরকারি বা ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ছিল নামমাত্র আর বিদেশী বিনিয়োগ ছিল না বললেই চলে। এরকমটা হওয়ার মূল কারণ ছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই তৎকালীন সরকার কর্তৃক শিল্প-ব্যাংক-বীমার রাষ্ট্রীয়করণ (আকাশ ২০০৪)। যদিও সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধেই এই নীতি পরিত্যাজ্য হয় এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু হয়। আশির দশকে বিশ্বব্যাংকসহ দাতাগোষ্ঠীর নির্দেশিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় অর্থনীতির নানামুখী উদারীকরণ কর্মসূচি শুরু হয়; বেসরকারীকরণ কর্মসূচি

ব্যাপক গতি পায়। বিনিয়োগ কাঠামোতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ স্পষ্ট হতে থাকে, দশকের শেষ দিকেই বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ অতিক্রম করে।

৪.৩.২। এক বা একাধিক গুর"ত্বপূর্ণ শিল্পের বিকশিত হওয়া

সত্তরের দশকে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প ছিল পাট শিল্প। আশির দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাতে চলছিল ভাঙ্গাগড়ার প্রক্রিয়া। মুক্তবাজার ও অর্থনৈতিক উদারীকরণের কর্মসূচি বাস্ড়বায়িত হচ্ছিল এবং তার সাথে পাট, বস্ত্র ও অন্যান্য পুরনো শিল্প সঙ্কটে পড়ে সংকুচিত হচ্ছিল (ইসলাম ২০১০)। নতুন শিল্প খাতের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প সবেমাত্র গড়ে ওঠতে শুর" করেছে। ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮২-৮৩ সময়কালে শিল্পখাতের আপেক্ষিক বিকাশ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ভিত্তিতে ভেঙে ভেঙে দেখলে দেখা যায়, এই সময়ে ক্ষুদ্র শিল্পের জিডিপিতে আপেক্ষিক অবস্থানের কোনো উন্নতি হয়নি বরং তার সামান্য অবনতি দেখা যায়, ৫.৫০ থেকে ৫.৪২ শতাংশ। কিন্তু একই সময়কালে উলেণ্ঢখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে, প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় এর আপেক্ষিক অবস্থান। ১৯৭২-৭৩ সালে এর আনুপাতিক অবস্থান ছিল ২.৪০, ১৯৮২-৮৩ তে এটি দাঁড়ায় ৫.৭১। ১৯৮২-র পর বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের আপেক্ষিক অবস্থান যখন স্থির অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, সামান্য ওঠানামা নিয়ে, সেই সময়কালে অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পে নেমেছে ধস। ১৯৮২ সালে ক্ষুদ্র শিল্পের আপেক্ষিক অবস্থান যা ছিল ৫.৪২, তার বড় ক্ষয় হয় আশির দশকেই, তা নেমে আসে ৩.৬৪ এ। আশির দশকে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সব শিল্পে অবনতি দেখা যায়। উলেণ্ঢখযোগ্য যে, আশির দশক হলো বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর 'সংস্কার' কর্মসূচির 'স্বর্ণ-দশক'। বাংলাদেশে এগুলোর সমন্বিত জোরদার প্রয়োগ দেখা যায় এই দশকেই (মুহাম্মদ ২০১০)।

বস্ড়ুত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রায় পুরোটাই বেসরকারি খাতে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্ড়র্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের কাতারে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন সরকারি বিভিন্ন নীতি ও দুর্নীতির কারণে ক্রমশ র"গ্ন হয়েছে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেই একই সময়ে আমরা বেসরকারি খাতের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোর মধ্যেও ক্ষয় ও ধস দেখি। আশির দশকে বেসরকারি খাতে যে ধরনের তৎপরতার বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হলো রপ্তানিমুখী কারখানা, বিশেষত তৈরি পোশাক ও রপ্তানিমুখী কারখানা। ১৯৮২ সালের দিকে এ দেশে শ'খানেক গার্মেন্টস কারখানা ছিল, ১৯৯০ নাগাদ এই সংখ্যা সাতশ' অতিক্রম করে। আলোচ্য সময়কালে শিল্পখাতের উলেণ্ঢখযোগ্য প্রবণতাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. সমগ্র অর্থনীতিতে শিল্পখাতের টেকসই কোনো অবস্থান সৃষ্টি হয়নি।

২. এই সময়কালে বড়, ছোট, মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলোর একটি অংশ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে। কিন্তু উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি কারখানাও এ সময়ে বন্ধ হয়েছে। অনেক শিল্প র"গ্ন হয়ে পড়েছে। বন্ধ কিংবা র"গ্ন হয়ে যাবার ঘটনাবলির পেছনে অবকাঠামো, অর্থসংস্থান, আমদানিমুখী নীতি, অসম প্রতিযোগিতা এবং রাষ্ট্রীয় সবরকমের বৈষম্যমূলক নীতি কাজ করেছে।

৩. আশির দশকে রপ্তানিমুখী বিভিন্ন কারখানা বিশেষত গার্মেন্টস কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যায়। রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রতি আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহের নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারের ভর্তুকি ও সুবিধা দানের নানা কর্মসূচি এবং সস্ড়া শ্রমশক্তির যোগান এই বিকাশ সম্ভব করেছে।

৪. সত্তর দশকের প্রথম দিকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোই শিল্পখাতের প্রধান মুখ্য ছিল। নব্বই দশকে এসে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ শতকরা ৮০ ভাগের স্থানে ৪০ ভাগে নেমে আসে।

৫. সত্তর দশক পর্যন্ড় বৃহৎ শিল্পগুলোই উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো। মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, চট্টগ্রাম স্টিল মিল ছিল এ দেশে শিল্পায়নের জন্য আবশ্যকীয় মূলধনী পণ্য প্রতিষ্ঠান। আশির দশকে এসে এগুলোর ক্ষয় ও বিলুপ্তির প্রক্রিয়া স্পষ্ট হয়।

৬. একদিকে নতুন রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে অন্যদিকে পুরনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা রুগ্ন হয়ে যাওয়ায় কর্মসংস্থান কমেছে। তার অর্থ হলো এই খাতে যে সংখ্যক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচিতে তার থেকে বেশি কর্মসংস্থান বিনষ্ট হয়েছে।

৪.৩.৩। প্রবৃদ্ধি সহায়ক উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠা

কোনো অর্থনীতির উন্নয়ন স্ড়রে অবস্থানের তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে- সেই অর্থনীতিতে যথাযোগ্য রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠবে, যা ঐ অর্থনীতির উন্নয়নের প্রবণতা এবং উদ্দীপনার যথাযথ ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধিকে স্বয়ংচালিত করবে। এই শর্তের দুটি অংশ- উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং স্বয়ংচালিত প্রবৃদ্ধি। স্বাধীনতা পরবর্তী দুই দশকে বাংলাদেশে উপযুক্ত রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো হিসেবে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও ছিল বেশ দুর্বল। ফলে নিম্ন প্রবৃদ্ধি ছিল অনিবার্য পরিণতি। চার শতাংশের আশেপাশের প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে 'আশির দশক' বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে স্থবিরতার দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উড্ডয়ন স্ড়রের নির্দেশকসমূহের ভিত্তিতে বিগত শতকের সত্তর-আশির দশকের বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপথ বিশেণ্ডষণ করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে, একটি নির্দেশক ছাড়া বাকি দুটি নির্দেশক দিয়ে সেই সময়ের বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং সিদ্ধান্ড় নেয়া যায় যে, আশির দশকের শেষেই এ দেশের অর্থনীতি উড্ডয়ন স্ড়রে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এ স্ড়রের চূড়ান্ড় মূল্যায়নের আগে আমরা স্মরণ করতে পারি, উড্ডয়নের পূর্বাবস্থায় বাংলাদেশের অর্থনীতির 'স্বয়ংচালিত হবার জন্য যে শক্তি অর্জন করার কথা ছিল, সেই শক্তি সমকালীন অর্থনীতি অর্জন করতে পারেনি। পূর্বের স্ড়রের এই অপূর্ণতার কথা স্মরণ রাখলে আশির দশকের শেষে বাংলাদেশের অর্থনীতির উড্ডয়ন স্ড়রে আরোহণ সঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে না। তাছাড়া আমরা যদি তিনটি নির্দেশকের দিকেই একটু গভীরভাবে তাকাই, তাহলে শুভঙ্করের ফাঁকিটি ধরতে পারব। যেমন, প্রথম নির্দেশক অনুযায়ী বাংলাদেশ কাঙ্খিত বিনিয়োগের হার অর্জন করেছিল। এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ খুবই জরুরি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সাথে সাথে প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপনা, দক্ষ শ্রমিক এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের সক্ষমতা (ইসলাম ২০১০)। অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও এই আনুষঙ্গিক উপাদানগুলোর স্বল্পতা দেখা যায়। আর সেক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না; তৃতীয় নির্দেশকটি বিশেণ্ডষণের সময় আমরা এই বাস্ড়বতার প্রতিফলনই দেখতে পাই। দ্বিতীয় নির্দেশকে যে এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের বিকশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলা যায়, আশির দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতৃস্থানীয় খাত কোনটি ছিল? বা আদৌ কোনো নেতৃস্থানীয় খাত ছিল কি না? উত্তরটি স্পষ্টতই নেতিবাচক হবে।

৪.৪। পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা

রস্টোর স্ড়র বিন্যাস অনুযায়ী এই প্রবন্ধে যেভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের কাল পর্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাতে ২০৩১ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির পূর্ণ বিকাশের স্ড়রে প্রবেশ করার

কথা। এত প্রাথমিক অবস্থায় (২০১২ সালে) এই স্ড়রের আলোচনা অপরিপক্ক হওয়াই স্বাভাবিক। তবে পর্যালোচনা অব্যাহত রাখলে কতিপয় মজাদার পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যাবে।

৪.৪.১। বিনিয়োগ জিডিপি'র ২০ শতাংশ পর্যন্ড় পৌঁছুবে

রস্টোর মতে অর্থনীতির পূর্ণ বিকাশের স্ড়রে বিনিয়োগের হার জিডিপির ২০ শতাংশ পর্যন্ড় পৌঁছে। নব্বই পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ইতিমধ্যেই ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। ২০১০-১১ সালে বিনিয়োগের হার ছিল জাতীয় আয়ের ২৪-২৫ শতাংশ, এবং এই বিনিয়োগের হারও বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হচ্ছে না। ২০১১-১২ বর্তমান অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭ শতাংশ। এখন ক্যাপিটাল- আউটপুট অনুপাত যদি ৪ হয়, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাজিত বলে পুরনো হিসাব-নিকাশ বলে, তাহলে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জিডিপির কমপক্ষে ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে (আহমেদ ২০১১)। কাজেই পূর্ণ বিকাশের পথে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ-জিডিপির যে অনুপাত রস্টো অর্জনের কথা বলেছেন তার চেয়ে বেশি বিনিয়োগ হার এখনই বাংলাদেশের আছে।

৪.৪.২। শিল্প বিকাশের ধারায় বৈচিত্র্য আসবে

একেবারেই সঙ্কীর্ণ শিল্প ভিত্তি নিয়ে যে দেশটির যাত্রা শুর" হয়েছিল চার দশক আগে, তার সাথে তুলনা করলে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের ধারায় বৈচিত্র্য এসেছে। নতুন শিল্প হিসেবে উঠে এসেছে হাল্কা প্রকৌশল শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, ওষুধ ও রসায়ন, চামড়া ও পাদুকা, সিমেন্ট শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি খাত। ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র খাত বলার মতো একটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, পাট খাতের পুনর্জীবন ঘটছে। ব্যাংক, বীমা, আর্থিক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশও শিল্প খাতে বৈচিত্র্য আনয়নে সহায়ক হয়েছে।

৪.৪.৩। আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্প গড়ে উঠবে, রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

সদ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে জাতীয়তাবাদী প্রেরণা থেকেই বাংলাদেশ আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্প কৌশল অবলম্বন করে, যদিও এ কৌশল কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনেনি। তারপরও বাংলাদেশে এমন কিছু পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে যেগুলো এক সময় চূড়ান্ড় প্রস্ড়ুত পণ্য হিসেবেই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত। কিছু বহুজাতিক কোম্পানি আগে যেমন তার উৎস দেশ থেকে সরাসরি কিছু পণ্য এদেশে বাজারজাত করতো, বর্তমানে তারা এদেশেই পণ্ঢান্ট স্থাপন করে সেসব পণ্য উৎপাদন করছে।

রপ্তানি উদ্বুদ্ধকরণ নীতিমালা নব্বইয়ের দশকের শুর" থেকেই বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। রপ্তানি ঝুড়ি'র তিন-চতুর্থাংশ তৈরি পোশাক দখল করে রাখলেও ধীরে ধীরে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়মিত রপ্তানি পণ্যের বহরে অপ্রচলিত পণ্য যোগ হচ্ছে।

পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রার নির্দেশকসমূহের উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে কেউ যদি এ সিদ্ধান্ড়ে পৌঁছেন, বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতি পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রার কাছাকাছি রয়েছে এবং নির্ধারিত সময়সীমার (অর্থাৎ ২০৩১ সাল) অনেক আগেই এ দেশের অর্থনীতি পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা শুর" করবে, তাহলে তাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা যাবে না। কিন্তু এ পর্যায়ে অন্ড়ত তিনটি বিষয়ে আরও গভীর বিশেণ্ঢষণের সুযোগ রয়েছে। প্রথমত, রস্টোর স্বকৃত পর্যালোচনাধীন কোনো দেশ এত দ্র"ত পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা শুর" করতে পারেনি, যে সকল দেশের বেশির ভাগই ধ্র"পদী শিল্প বিপণ্ঢবের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রা শুর"র প্রাক্কালে একটি দেশের অর্থনীতি যতটুকু 'তৃপ্ত' অবস্থায় থাকার কথা, বাংলাদেশের অর্থনীতি সেই 'তৃপ্তি'র অবস্থায় এখনো নেই, অদূর

ভবিষ্যতে সেই অবস্থা হবে না বলেই মনে হয়। অন্ড়ত তিনটি বাস্ড়বতার (এক-তৃতীয়াংশ দরিদ্র খানা, আয়ের ক্রমবর্ধমান অসমতা ও নিরন্ড়র পরিবেশের অবক্ষয়) প্রেক্ষিতে এ কথা বলাই যায়। তৃতীয়ত, এই স্ড়রের শেষ দুইটি নির্দেশকের অনির্দিষ্ট অবস্থা স্ড়রটির বস্ড়ুনিষ্ঠ মূল্যায়নের পরিপন্থি। যেমন, শিল্প বিকাশের ধারায় বৈচিত্র্য আসবে, এখানে বিকাশের ধারা নির্দিষ্ট করা হয়নি। ভারী শিল্পের ধারায় বৈচিত্র্য আসা আর ক্ষুদ্র শিল্পের ধারায় বৈচিত্র্য আসার প্রভাব অর্থনীতিতে নিশ্চয়ই এক নয়। ভারতে যেমন ঐতিহাসিক ভাবে ইস্পাতের মতো ভারি শিল্প গড়ে উঠেছে, বাংলাদেশে বলার মতো কোনো ভারি শিল্প গড়ে উঠেনি, যার অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে মনোযোগী হয়েছে। তৃতীয় নির্দেশকে আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্প গড়ে উঠার কথা বলা হয়েছে— কোন ধরনের, কি পরিমাণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা এই নির্দেশক থেকে পাওয়া যায় না। একই কথা প্রযোজ্য রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

৫। উপসংহার

প্রবন্ধটির সাধারণ উদ্দেশ্য অনুযায়ী এতক্ষণ রস্টোর স্ড়র তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলো। রস্টোর স্ড়র তত্ত্ব দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ পর্বের 'সনাতন সমাজ'কে যতখানি সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, অন্য কোনো স্ড়রকে ততখানি সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সনাতন সমাজের নির্দেশকসমূহের উপস্থিতিও সেই স্ড়রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সেগুলো স্ড়র উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী স্ড়রসমূহে নানা মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী স্ড়রসমূহের বেশির ভাগ নির্দেশকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। তার অর্থ দাঁড়ায়, একই দেশে একই সময়ে রস্টো বর্ণিত একাধিক স্ড়রের বৈশিষ্ট্য বিরাজ করতে পারে। আসলে রস্টোর বর্ণনায় উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে কিছুটা সরলীকরণ করা হয়েছে এভাবে যে, একটি দেশ সামগ্রিকভাবেই এক স্ড়র থেকে আরেক স্ড়রে পৌঁছে যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এবং অর্থনৈতিক শ্রেণির মধ্যে উন্নয়নের গতিতে পার্থক্য থাকতে পারে, এ ধরনের সম্ভাবনার কথা তার বিশেণ্ডষণে স্থান পায়নি। রস্টোর উড্ডয়নের পূর্বাবস্থার নির্দেশকসমূহ দিয়ে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশকে সবচেয়ে কম ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ সমকালীন বাংলার অর্থনীতিতে এই স্ড়রের নির্দেশকসমূহের উপস্থিতি নিম্ন মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ ক্ষেত্রে এখানে একটি vaccum পরিলক্ষিত হয়। সেই তুলনায় উড্ডয়নের স্ড়রের নির্দেশকগুলো দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দুই দশকের অর্থনৈতিক গতিপথকে একটু বেশি ব্যাখ্যা করা যায়। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, পরবর্তী স্ড়র তথা পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রার নির্দেশকসমূহ আরও বেশি করে সমসাময়িক অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এক পর্যায়ে মনে হয়, রস্টোর মডেলের নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশের অর্থনীতি ঐ স্ড়রে পৌঁছে যাবে। রস্টোর স্ড়র তত্ত্বের চূড়ান্ড় পর্যায়ে অর্থাৎ উচ্চ গণভোগের কালে পৌঁছাতে বাংলাদেশের অর্থনীতির আরও অর্ধ শতাব্দী লাগার কথা। অথচ বর্তমানেই সেই স্ড়রের নির্দেশকসমূহের উপস্থিতি কিছু মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বর্তমানে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের (উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত) আয় বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যাতে তারা তাদের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য ভোগ্য পণ্য (বিশেষত টেকসই পণ্য) এবং সেবা খাতের জন্য যথেষ্ট খরচ করতে পারে। শ্রমশক্তির কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন এসেছে, যার ফলে একদিকে নগরভিত্তিক শ্রমিকের অংশ (বড় আকারে গ্রামীণ শ্রমিকের উপস্থিতির পাশাপাশি) বেড়েছে এবং অন্যদিকে দক্ষ ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল শ্রমিকের (যেমন, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে) অংশও বেড়েছে। প্রতি বছরই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওপর বরাদ্দ বাড়ছে। তবে পূর্ণ বিকাশের পথে যাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া বা উচ্চ গণভোগের কালের নির্দেশকসমূহের সাময়িক উপস্থিতি থেকে খুব বেশি প্রীত হওয়ার কিছু নেই। রস্টোর মতে, ভারত সেই পঞ্চাশের দশকেই উড্ডয়নের স্ড়র অর্জন করেছিল। তারপর পেরিয়ে গেছে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময়। রস্টোর

তত্ত্ব অনুযায়ী এই সময়ে ভারতের পূর্ণ বিকাশের স্ড়র পেরিয়ে উচ্চ গণভোগের স্ড়রে পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু বাস্ড়বে তা ঘটেনি। সামগ্রিকভাবে ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশও (সংখ্যায় বেশি) বাংলাদেশের মতোই উচ্চ গণভোগের স্ড়রে পৌঁছেছে। অন্যদিকে জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন, যাদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই। মোট কথা, রস্টো বর্ণিত উড্ডয়নের স্ড়র অর্জনের পঞ্চাশ বছর পরও ভারতের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে এখনও পূর্ণ বিকাশের পথেই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও যে এমনটি ঘটবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

প্রবন্ধের শুর"তে এই গবেষণার ঘোষিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি ছিল, রস্টোর তত্ত্বে উলেণ্ডখিত কোনো স্ড়র দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো কালপর্বকে চিহ্নিত করা যায় কিনা সেটি পরীক্ষা করা। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষণ শেষে সরল উত্তরটি হচ্ছে, এক বা একাধিক কাল পর্বকেই চিহ্নিত করা যায় তবে খুব বিশুদ্ধ (এবং পরিপূর্ণ) ভাবে নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকাশ, এম এম (২০০৪): 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,' আনিসুজ্জামান (২০০০), নির্বাচিত প্রবন্ধ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

আলম, খুরশিদ (২০০০): 'উন্নয়নমূলক সমাজবিজ্ঞান,' মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

আহমেদ, আবু (২০১১) : 'বিনিয়োগের বর্তমান খরায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না', কালেরকণ্ঠ, ২৭ জুন, ঢাকা।

ইসলাম, নজর"ল (২০১১) : 'বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যৎ,' প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

————(২০১২): 'আগামী দিনের বাংলাদেশ,' প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

ইসলাম, রিজওয়ানুল (২০১০): 'উন্নয়নের অর্থনীতি,' দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল (২০০০): 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১/২য় খ"/ অর্থনৈতিক ইতিহাস,' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

খান, আকবর আলী (২০১০): 'পরার্থপরতার অর্থনীতি,' দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

————(২০১১): 'অন্ধকারের উৎস হতে,' পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

মুহাম্মদ, আনু (২০১০): 'বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও দারিদ্র্য', bdnews24.com।

ফার"ক, আবদুলণ্ডাহ (১৯৮৩): 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ঢাকা।

রহমান, মো: আনিসুর (২০০৪): 'পথে যা পেয়েছি দ্বিতীয় পর্ব,' অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

রাজকূট, সংখ্যা ২২, ১৬ জুন, ২০১০, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্র"প লি:, ঢাকা।

সেন, অমর্ত্য (১৯৯০): 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি,' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

Anisuzzaman (2000): *Nirbachito Probondoh,* Anyaprokash, Dhaka.

Karim, A. (1959): *Social History of the Muslims in Bengal down to 1538 A.D.* Asiatic Society of Pakistan, Dhaka.

Junankar, P.N. (1989): *Marx's Economics*. Heritage Publishers. New Delhi.

Majumdar, R.C. (1943): *The History of Bengal (Hindu Period),* Vol.1, University of Dhaka, Dhaka.

Parkinsm, J. and Parkinsm (1976): Bangladesh : Test Case for Development, Dhaka, UPL.

Rostow, W. W. (1960): *The Stages of Economic Growth: a Non Communist Manifesto*: Cambridge: Cambridge University Press.

Roy, Nihar Ranjan (1949): *Bangaleer Itihas (Adi porbo*), Sasoto Prokashon, Kolkata.